******আরবি সাহিত্যে যারা অনার্স-মাস্টার্স বা কামিল করেছেন তাদের জন্য******

***** এনটিআরসিএ সিলেবাসভুক্ত আরবি সাহিত্য অধ্যায় থেকে কবি এবং তাদের কবিতা সকলের জন্য পড়তে হবে*****

আরবি কবি সাহিত্যিকদের উপাধি ও অন্যন্য তথ্য

১. **শায়েরু নীল/নীল নদের কবি/আরবীয় নজরুল/স্বাধীনতার কবি/ বিদ্রোহী কবি**-হাফিজে ইব্রাহীম-

২. **দুই ভূখন্ডের কবি**-খলিল মুতরান-

৩. **আমিরুশ শুয়ারায়া/গীতি নাট্যের প্রবতক**- আহমদ শাওকী-

৪. **প্রকৃতির কবি/আরবীয় জীবনান্দ দাস**- মারুফুর রুসাফী-

৫. **ছন্দের যাদুকর/উপমার কবি/ভবঘুরে যুবরাজ/জাহান্নামের পতাকাবাহী কবি**- ইমরুল কায়েস-

৬. **শায়েরু শুয়ারা**-আহমদ আল বারুদী-

৭. **নবেল বিজয়ী কবি**- নাজিব মাহফুজ-

৮. **দাশনিক কবি**- আবুল আলা মায়াররী-

৯. **দুঃখবাদী কবি**- শানফারা-

১০. **শায়েরুর রাসূল (সাঃ)-** হাস্‌সান বিন সাবিত-

১১. **মাকামা সাহিত্যের জনক**- বদিউজ্জামান হামদানি-

১২. **নাটকের জনক**- সিরিয়ার প্রখ্যাত সাহিত্যিক মারুন আন নাক্কাশ-(১৮১৭-১৮৫৫)
প্রথম আরবি নাটক 'আল বাখীল' (কৃপণ)।

১৩. **আধুনিক আরবি নাটকের জনক/ শ্রেষ্ঠ নাট্যকার**- তাওফিক আল হাকীম-(১৮৯৮-১৯৮৭) (হামিদ আল দামানহুরী)
১.আয়দী আল নায়িমাহ-১৯৫৯, ২.সুলায়মান আল হাকিম-১৯৪৩, ৩.লুবাত আল মাউত-১৯৫৭ নাটক, ৪. সালাত আল মালায়িকা-১৯৬৫।

১৪. **আধুনিক ইসলামিক নাটকের জনক**-ডঃ নজীর আল কালানী (১৯৩১-১৯৯৫)।

১৫. **উপন্যাসের জনক**- আনতোন আন শাকীল-(১৮২৪-১৮৮৫),,*আধুনিক আরবি উপন্যাসের সূতিকাগার-লেবান, * আরবি সাহত্যের প্রথম শিল্পসমৃদ্ধ উপন্যাস-যয়নব (১৯১৭)-মুহাম্মাদ হোসাঈন হায়কাল(১১৮৮-১৯৫৬)। (হিমার আল হাকিম-তৌফিক আল হাকিম)

১৬. **ছন্দের আবিষ্কারক**- খলিল বিন আহমদ-
গোড়াপত্তন করেন- মাদ্রাসাতুর আলসুনি (ভাষা ইনিস্টিটিউট)।

১৭.**আরবি সাহিত্যে একমাত্র নবেল জয়ী ব্যক্তি-** নাজীব মাহফুজ,মিশর,কায়রো-(১৯১১-২০০৬)-
তিনি ১৯৮৮ সালে সাহিত্যে (**ছালছাতুল কাহেরাতু**) **'কায়রো ট্রিলজি'** (৩ খন্ডে বিভক্ত) গ্রন্থে নবেল পুরস্কার পান।
৩ টি খন্ড

১. **বায়েন আল কাসরাউ**-১৯৫৬ (ইংরেজী নাম: প্যালেস ওয়াক-১৯৯০)(বাংলা নাম: দু প্রাসাদের মাঝে)।

২. **কাসর আল শাওক**-১৯৫৭ (ইংরেজী নাম: প্লেস অব ডিজাইয়ার-১৯৯২)(বাংলা নাম: ভিলাষের প্রাসাদ)।

৩. **আস্‌সুক্কারিয়্যাহ**-১৯৫৭ (ইংরেজী নাম: সুগার স্ট্রিট -১৯৯২)(বাংলা নাম: চিনির গামলা)।

* তার নবেল বিজয়ী ত্রয়ী উপন্যাসে যে কাহিনী বিবৃত হয়েছে; তার উপন্যাসে (১৯১৭-১৯৪৪ খ্রিষ্টাব্দ) সমকালীন একটি মিসরীয় পরিবারের ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক উত্থান-পতনের কাহিনী বিবৃত হয়েছে।

১৮. আরবি সাহিত্যের সমালোচক- আছায়া'লা বিইয়্যু এবং ড. আহমদ আমীন- (আঠারো শতক-১৯৫০) তার আরবি সাহিত্যের সমালোচনা মূলক গ্রন্থ- **'আন নকুদুল আদ্দাবিইয়্যু'**

১৯. পাশ্চাত্যেও চিন্তা ও ভাব ধারায় পরিপুষ্ট কবি কারা- ১.খলিল মাতরান-১৮৭২-১৯৪৯) ২. আব্বাস মাহমুদ আক্বাদ(১৮৮৯-১৯৬৪)। ৩. ইবরাহীম আল মাযীনী(১৮৯০-১৯৪৯)।

২০. আধুনিক যুগের আরবি কবিদের কয়টি সম্প্রদায়ে ভাগ করা যায়: ৫ টি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা:-

১. নব্য প্রাচীন সম্প্রদায়।

২. প্রাক রুমান্টিক কবি সম্প্রদায়।

৩. রোমান্টিক কবি সম্প্রদায়।

৪. অভিবাসী কবি সম্প্রদায়।

৫. আধুনিক কবি সম্প্রদায়।

২১. ইলমে নাহুর প্রতিষ্ঠাতা– আবুল আসওয়াদ দুয়াইলি-বসরা,ইরাক (৬০৩-৬৮৮খ্রি.)-ডাক নাম: দিলি বা দুওয়াইলি।তিনি আলী বিন আবু তালিবের কবি সঙ্গি ও ব্যাকরণবিদ ছিলেন।

২১. মিজান ও মুনশাইব গ্রন্থের লেখক- শাইখ সিরাজউদ্দিন (র.) এবং মাওঃ হাফিজুর রহমান যশোরী।

** কবির নাম এবং অর্থসহ কয়েকটি আরবি কবিতা মুখস্থ করতে হবে**

আরবী সাহিত্যের যুগ বিভাগ

আরবি সাহিত্যের ইতিহাসকে মুলত ৫ ভাগে ভাগ করা যা। আাবার কোথাও ৬ ভাগ দেওয়া আছে।

১. জাহেলী যুগ ২. ইসলামমি যুগ ৩. উমাইয়া যুগ ৪. আব্বাসি যুগ ৫.ওসমানী যুগ ৬. আধুনিক যুগ।

যুগ অনুযায়ী বিবরণঃ-

১.	**জাহেলী যুগ** **(৪৫০-৬২২ খ্রি.)** এ যুগের শ্রেষ্ঠ রচনা হলো সাবয়া মুয়াল্লাকা এছাড়াও নাবেগা, আ'সা ক্বায়েস ও সানফারা এ যুগের কবি। বাগ্মী হেসেসে খ্যাত ক্বুস বিন সা'য়াদ এবং আমর ইবনে মা'দিকারব	**মুয়াল্লাকার সাতজন কবি হলেন;** ১. ইমরুল কায়েস ২. তুরফা বিন আব্দুল বিকরি ৩. যুহাইর বিন আবি সালমা ৪. লাবিদ বিন রাবিয়াা ৫. আমর বিন কুলসুম ৬. হারিস বিন হিলজা ৭. আনতারা বিন সাদ্দাদ	
২.	**ইসলামমি যুগ** **(৬২২-৬৬১ খ্রি.)** {কা'য়াব বিন যুহাইর হাস্‌সান বিন সাবেদ, খানসা (মহিলা কবি)} = মুখদারাম কবি ছিলেন।	১. কা'য়াব বিন যুহাইর ২. হাস্‌সান বিন সাবেদ ৩. খানসা (মহিলা কবি) ৪. আব্বাস বিন মিরদাস ৫. আমের বিন তুফায়েল ৬. নাবেগা বিন জা'দি	

৩.	**উমাইয়া যুগ** **(৬৬১-৭৫০ খ্রি.)**	১. আখত্বাল ২. ফারাযদাক্ব ৩. জারির ৪. সাহবান ওয়াল (খতিব) ৫. হাজ্জাজ বিন ইউসুফ (খতিব)।	
৪.	**আব্বাসি যুগ** **(৭৫০-১২৫৮ খ্রি.)**	**কবিগণের তালিকা:** ১. আবু তাম্মাম ২. বুহতারি ৩. জাহিজ ৪. মুতানাব্বি ৫. ইবনু রুমি ৬. আবু নুওয়াস **সাহিত্যিকগণ তালিকা:** ১. বদিউজ্জামান হামদানি ২. হারিরি ৩. ইবনুর মুকাফ্ফা (কালিলা ও দিমনা ৪.খোয়ারেজমি ৫. আল ক্বাজি আল ফাজেল ৬. সাহেব বিন আববাদ ৭. ইবনুল উমিদ।	
৫.	**ওসমানীয় যুগ** **(১২৫৯-১৭৯৭ খ্রি.)** এ যুগ ছিল আরবি সাহিত্যের পতনের যুগ/তুরকী যুগ	১. ইবনে খাল্লিকুন ২. ইবনে মানযুর ৩. বুসিরি ৫. ইবনে আবদে রাব্বুহি ৫. ইবনে যাইদুন	

৬.	**আধুনিক যুগ** **(১৭৯৮-অদ্যবধি খ্রি.)**	১. আহমদ শাওকী ২. হাফিজে ইব্রাহীম ৩. নাজিব মাহফুজ ৪. মা'রুফুর রুসাফি ৫. ত্বহা হোসেন ৫. আহমাদ আল আমিন ৭. তৌফিক আল হাকিম ৮. মুস্তফা লুতফি আল মানফুলতি ৯.খলিল মুতরান ১০. মুহাম্মাদ রশিদ রেজা	

ইলমুল বালাগাত কাকে বলে?

সংজ্ঞাঃ بلاغت শব্দের আভিধানিক অর্থ- কোন কিছুর চূড়ান্তে পৌঁছা।

পারিভাষিক অর্থে বালাগাত

الْحَالِ مُقْتَضَى حيث من .الْبَلَغَا كَلَامِ تَرَكِيبِ أَحْوَالِ عَنْ فِيهِ يُبْحَثُ عِلم هُوَ

ঃইলমুল বালাগাত ঐ ইলমকে বলে, যাতে বুলাগা বা অলংকার শাস্ত্রবিশারদদের অবস্থার চাহিদা অনুসারে ব্যবহৃত বাক্য গঠনের অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়।চ

আবার কারও কারও মতে ইলমে বালাগাত এমন কতগুলি নীতিমালা জানার নাম, যা দ্বারা অবস্থার চাহিদা অনুসারে বক্তব্য উপস্থাপন করা সম্ভব হয়।

উদ্দেশ্যঃ ইলমে বালাগাতের উদ্দেশ্য হলো, অবস্থার চাহিদার বিপরীত বাক্য ব্যবহার করা হতে বেঁচে থাকা।

আলোচ্য বিষয়ঃ শব্দ ও অর্থই হচ্ছে ইলমে বালাগাতের আলোচ্য বিষয়।

ইলমুল বালাগাতদ এর পাঠ্যকিতাবঃ তালখীছুল মিফতাহ্ ও দুরূসুল বালাগাত, মুখতাছারুল মুআনী।

ইলমুল আদব

সংজ্ঞাঃ শব্দের আভিধানিক অর্থ- দাওয়াত, ডাকা, আহবান করা ইত্যাদি। তাছাড়া এ শব্দটি মনের প্রফুল্লতা, শিষ্টাচার এবং প্রত্যেক বস্তুকে তার আপন স্থানে রাখা প্রভৃতি ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হয়। আর পরিভাষায়

الْعَرْبِ كَلَامِ فِي الْخَطَاءِ أَنْوَاعِ جَمِيعِ عَنْ بِهِ يُحْتَرَزُ عِلْمٌ هُوَ

. وَكِتَابَةً لَفظًا

অর্থাৎ ইলমুল আদব ঐ ইলমকে বলে, যার প্রতি লক্ষ্য রাখলে আরবী ভাষা লেখা ও বলার ক্ষেত্রে যাবতীয় ভুল-ত্রুটি থেকে নিরাপদে থাকা যায় ।

উদ্দেশ্যঃ ইলমুল আদাবের উদ্দেশ্য হলো, মনের ভাব অন্যের নিকট অতি উত্তমরূপে ব্যক্ত করা।

আলোচ্য বিষয়ঃ কারও কারও মতে ইলমুল আদাবের আলোচ্য বিষয় হল গদ্য। আবার কারও কারও মতে পদ্য। তাছাড়া কেউ কেউ বা কাব্য সম্পর্কে পরিচিতি লাভ করাকেও ইলমুল আদাবের আলোচ্য বিষয় বলে উল্লেখ করেছেন।

ইলমুল আদব -এর পাঠ্যকিতাবঃ দিওয়ানে হামাসাহ, আল মাকামাতুল হারীরিয়্যাহ, মুজিযাত আল-কিরাআতুর রাশিদাহ্, মুফীদুত্ ত্বালিবীন । নাহাতুল আরব ও লামিয়াতুল আল কিরাআতুল ওয়াযিহাহ্

ইলমুল মানুতিক

منطق শব্দটি نطق শব্দ হতে উদ্‌ভূত। نطق শব্দের আভিধানিক অর্থ- কথা।

পারিভাষিক অর্থে-

الفِكْرِ فِي الْخَطَاءِ عَنِ الَّذِهْنَ مَراعَتُهَا تَعْصِمُ بِقَوَانِينَ عِلم المَنْطِقُ

অর্থাৎ ইলমে মাতিক এমন কতগুলি নীতিমালা জানার নাম, যা মেধা-মনন বা মস্তিস্ককে চিন্তা ও ধ্যান-ধারনার ভুল-ভ্রান্তি হতে রক্ষা করে।

উদ্দেশ্যঃ চিন্তাশক্তিকে ভুল-ভ্রান্তি হতে রক্ষা করা ।

আলোচ্য বিষয়ঃ ইলমুল মানতিকের আলোচ্য বিষয় হল, ঐ সকল জানা বিষয়, যা অজানা বিষয়ে জ্ঞান লাভ করতে সাহায্য করে।

ইলমুল মানতিক এর পাঠ্যকিতাবঃ সুল্লামুল উলূম, তাইসীরুল মানুতিক ছুগরা-কুবরা, শরহে তাহযীব, মিরকাত।

কবি ইমরুল কায়েসের জীবনী (৪৮০/৫০০-৫৪০)

ইসলাম পূর্ব যুগে আরবে উকাজ এর মেলা খুব প্রসিদ্ধ ছিল। এই মেলায় কবিরা তাদের কবিতা শোনাতেন। যে কবিতাটি সব থেকে ভালো হত সেই কবিতাটি সোনার হরফে লিখে পবিত্র মক্কার কাবার দরজায় টাঙিয়ে দেওয়া হত। যেহেতু এগুলো টাঙিয়ে রাখা হত তাই এর নাম রাখা হয় মুআল্লাক্বা। ইমরুল কায়েস ছিলেন মুআল্লাক্বা রচয়িতাদের মধ্যে একজন। তিনি ৬ষ্ঠ শতকের আরবি ভাষার উল্লেখযোগ্য ও শ্রেষ্ঠ কবি। তার পুরো নাম হল ইমরুল কায়েস বিন হুযর আল কিন্দি। তার পিতার নাম হুযর ইবনে আল-হারিছ এবং মাতার নাম ফাতিমা বিন্তে রাবিয়াহ আল-তাগলিবি।

তার দাদা ছিলেন হারিস ইবন আমর। ৫০০ খ্রিস্টাব্দের দিকে হারিস বিশেষ শক্তির অধিকারী ছিলেন। হীরার অধিপতি তৃতীয় মুনযিরকে পরাজিত করে তিনি কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন, কিন্তু পরবর্তীকালে মুনযির কর্তৃক পরাজিত ও নিহত হন। তার মৃত্যুর পর কিন্দী রাজত্ব দুর্বল হয়ে পড়ে। তার সন্তানরা ক্ষমতার লড়াইয়ে বিভক্ত হয়ে পড়লে কবির পিতা হুজ্র বনু আসদ গোত্রের নেতৃত্ব লাভ করেন। কিন্তু কিছুকাল পর বনু আসদ বিদ্রোহ করে ও হুজরকে নিহত করে। কবির মাতা ছিলেন তাগলিব গোত্রের সুবিখ্যাত সরদার কুলয়বের বোন। এটা নিশ্চিত নয় যে আল-হারিছ কিভাবে মারা গিয়েছিলো, কিন্ত কিছু উৎস থেকে জানা যায় তাকে বন্দি করা হয়েছিলো, এবং তাকে তার দুই পুত্র ও তার গোত্রের চল্লিশের ও বেশি লোকজনের সাথে হত্যা করা হয়েছিলো।

কিনদাহ বংশের আদি আবাসস্থল ছিলো দক্ষিণ আরবে, সেখান থেকে তারা উত্তরে অগ্রসর হয়ে ৪র্থ অথবা ৫ম শতাব্দির দিকে নাযদে বসবাস শুরু করে। ৫ম শতাব্দির দিকে তারা ইয়েমেনের রাজাকে তাদের জন্য একজন রাজা নির্বাচনের আরজি জানায়, এবং হূযর আকিল আল-মুরার প্রথম কিনদাহ রাজা নির্বাচিত হয়। হূযর আকিল আল-মুরারের পরবর্তী রাজা ছিলো তার পুত্র আমর, তার পরবর্তীতে তার পুত্র আল-হারিছ, যিনি ছিলেন কিনদাহ রাজাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। আল-হারিছের পুত্রদের মধ্যে একজন হূযর। আর হূযর ছিলেন ইমরুল কায়েসের পিতা।

ইমরুল কায়েসের জন্ম নিয়ে ইতিহাসবিদগণের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে, তবে ধারণা করা হয় তিনি ৫০১ অথবা ৫২৬ খ্রিষ্টাব্দের দিকে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি আসাদ ও ঘুতফান বংশের রাজা হূযরের সর্বকনিষ্ঠ সন্তান ছিলেন। তিনি শৈশবকাল থেকেই কবিতা লিখতেন, কিন্ত এইটা তার পিতা খুব অপছন্দ করতেন কারণ একজন রাজার সন্তানের জন্য এইটা যথোপযুক্ত নয়। কবিতা, গান আর সুরা এই নিয়ে ছিল তার জীবন।
ঘরের চাইতে বাইরের দিকেই তার টান ছিল বেশি। তাই তিনি 'ভবঘুরে যুবরাজ' নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি বাল্যকালে কবিতা রচনা শুরু করলে তার পিতা তাকে বাড়ি থেকে বের করে দেন। তারপর তিনি বনে জঙ্গলে ঘুরে বেড়িয়ে মদ্যপায়ী জীবন শুরু করেন। তার প্রেমিকার নাম ছিল উনাইযা। তিনি হলেন আরবি ভাষায় লেখা বিখ্যাত কাব্য সংকলন মুআল্লাক্বা র অন্যতম ও শ্রেষ্ঠ লেখক।

তার পিতার সাথে বৈসাদৃশ্যের আরেকটি কারণ হলো ইমরুল কায়েস অতিরিক্ত মদ্যপায়ী ও মহিলার প্রতি আকর্ষণ। একটি কাহিনি থেকে জানা যায় ইমরুল কায়েস তার চাচাতো বোন উনাইযা কে ভালোবাসতো, তাকে বিয়ে করার চেষ্টা ব্যর্থ হলে তার সাথে গোপনে সম্পর্ক রাখতে চায়, যা তার পরিবারের জন্য লজ্জাজনক, এ কারণে তাকে তার পিতা বর্জন করে। আরেকটি কাহিনি থেকে জানা যায় ইমরুল কায়েস তার পিতার স্ত্রীদের ও দাসীদের নিয়ে বাজে কবিতা চয়ন করেন, একারণে তাকে বর্জন করা হয় । কারণ যাই হোক না কেনো অধিকাংশ কাহিনি একমত যে, হূযর তার পুত্রের আচরণে ক্রুদ্ধ হয়ে তাকে রাজ্য থেকে বিতাড়িত করেন।

কিছু কাহিনি থেকে জানা যায়,যখন ইমরুল কায়েসের পিতা নিহত হন তখন তিনি তার বাবার সৈন্যবাহিনীর পক্ষে যুদ্ধ করছিলেন, কিন্ত এই ব্যাপারে সবাই একমত নয়। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কাহিনি ইবনে আল-কালবি থেকে জানা যায়, ইবনে আল-কালবির মতে, যখন তার পিতা মারা যান তখন তিনি নির্বাসনে ছিলেন। পিতার মৃত্যুসংবাদ যখন তার কাছে পৌছায় তখন তিনি তার বন্ধুদের সাথে আনন্দ ফুর্তিতে লিপ্ত ছিলেন। মৃত্যু সংবাদ শোনার পর তিনি বলেন, আল্লাহ আমার পিতার প্রতি দয়াবান হোক। যখন আমি ছোটো ছিলাম তিনি আমাকে বিপথে ঠেলে দিয়েছেন, এখন আমি পুর্নবয়স্ক আর তার মৃত্যুতে ভারাক্রান্ত। আজ কোনো সতর্কতা থাকবে না এবং কাল থাকবে না কোনো উন্মত্ততা। তিনি উচ্চারণ করেন তার বিখ্যাত উদ্ধৃতি: "আজকের দিন শুরা পানের আর কালকের দিন গুরুত্বপূর্ণ কাজের।" (আরবিতেঃ " اليوم خمر وغداً أمر")

অতঃপর পিতার মৃত্যুর প্রতিশোধ না নেয়া পর্যন্ত গোশ্ত ও শরাব মোটেই স্পর্শ না করার এবং মাথায় তেল না দেয়ার শপথ করেন তিনি। তার মাতুল গোত্র বনু তাগলিব ও বনু বকর এর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন।বলা হয় যে ইমরুল কায়েসের ভাইদের মধ্যে তিনিই ছিলেন পিতার হত্যার প্রতিশোধ নেয়ার মতো একমাত্র দায়িত্ববান। একটি কাহিনি থেকে জানা যায় যে, ইমরুল কায়েসের উগ্র মুর্তি দেখে আসাদ গোত্র তার কাছে একজন গোয়েন্দা প্রেরণ করে এবং তাকে তিনটি উপায়ন্তর প্রদান করে, তিনি তার পিতার হত্যার বদলে তাদের কোনো উচ্চপদস্থ ব্যক্তিকে হত্যা করবেন অথবা তিনি সহস্র ভেড়া ও উটের সমপরিমাণ অর্থমূল্য গ্রহণ করবেন অথবা তিনি তাদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হবেন সেক্ষেত্রে তাদের প্রস্তুতির জন্য একমাস সময় দিতে হবে। ইমরুল কায়েস তৃতীয় উপায় পছন্দ করলেন। বকর ও তাগলিব গোত্র তাকে সমর্থন জানালো এবং আসাদ গোত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে অসংখ্য লোককে হত্যা করলো। বকর ও তাগলিব গোত্র

যখন বুঝলো যে, হত্যার প্রতিশোধ নেয়ার জন্য যথেষ্ট লোককে হত্যা করা হয়েছে তখন তারা তাদের সমর্থন তুলে নিলো।

এসময় তাদের প্রাচীন এক শত্রু হীরাধিপতি তৃতীয় মুনযির নিজের প্রভাব খাটিয়ে কবির প্রতিশোধ গ্রহণের কাজে বাধার সৃষ্টি করেন। ফলে মিত্র গোত্রদের সমর্থন হারিয়ে কবি নিরাশ হয়ে মদীনার উত্তরে তায়মা নামক স্থানে তার দুর্গ আবলাকে বাস করতেন। এসময় প্রতিশোধ নেওয়ার বাসনায় সাহায্য চাইতে তিনি কনস্টানটিনোপোলের পথে যাত্রা করেন। তিনি রোম সম্রাটের নিকট যাওয়ার পর

সম্রাট তাকে সাদরে গ্রহণ করেন। তার উদ্দেশ্য ছিল কবির প্রতিশোধ স্পৃহাকে সাম্রাজ্য বিস্তারে কাজে লাগানো। কিন্তু কবির এক শত্রু তিমাহ আসদী তখন সম্রাটের নিকটে কবির বিরুদ্ধে অভিযোগ করে। ফলে সম্রাট কবির প্রতি সন্দিগ্ধ হয়ে পড়েন। কবির সঙ্গে একদল সৈন্য প্রেরণ করেও অর্ধেক পথ থেকে তা ফিরিয়ে নেন। আর কবি এক অদ্ভুত রোগে আক্রান্ত হন। তার সমস্ত শরীর দগদগে ঘায়ে ভরে যায়। কেউ বলে এটি রোগ, কেউ বলে এটি সম্রাট জাস্টিনিয়নের দেয়া বর্মের বিষাক্ত প্রতিক্রিয়া। এই কারণে তাকে ক্ষতযুক্ত ব্যক্তিও বলা হয়। কথিত আছে সম্রাটের কন্যার সঙ্গে কবির অবৈধ প্রেমের কারণে সম্রাট কবিকে বিষযুক্ত বর্ম দান করেছিলেন, যা পরবর্তীতে কবির সারা দেহে ক্ষতের সৃষ্টি করেছিল। সে যাই হোক, এর ফলে আরবের সবচেয়ে শক্তিমান এই কবি অসুস্থ হয়ে আঙ্কারায় **৫৪০ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন**। ইমরুল কায়েসের কবিতাগুলো কবি হাম্মাদ আর রাবিয়া আব্বাসি যুগে সংকলন করেন।

কবি কা'ব বিন যুহাইর বিন আবী সালমা

কায়াব ইবনে যুহাইর ছিলেন **৭ম শতাব্দির আরবের** এক অভিজাত বংশদ্ভূত একজন প্রখ্যাত কবি। তিনি কাফির ছিলেন এবং নাবী কারীম (ﷺ)-এ নামে কুৎসা রটনা করতেন। এদিকে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যখন ত্বায়িফ যুদ্ধ হতে ফিরে আসেন (৮ম হিজরী) তখন কা'বের নিকট তার ভাই বুজাইর বিন যুহাইর এ মর্মে পত্র লিখেন যে, 'রাসূলুল্লাহ (ﷺ) মক্কার এমন কয়েক ব্যক্তিকে হত্যা করেছেন যারা তাঁর নামে কুৎসা রটনা করত এবং তাঁকে কষ্ট দিত। কুরাইশদের ছোটখাটো কবিগণের মধ্যে যার যে দিকে সুযোগ সুবিধা হয়েছে সে সেদিকে পলায়ন করেছে। অতএব, যদি তুমি প্রাণে রক্ষা পেতে চাও তাহলে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর খিদমতে গিয়ে হাজির হয়ে যাও। কারণ, নাবী কারীম (ﷺ)-এর দরবারে গিয়ে কেউ তওবার সঙ্গে ক্ষমা প্রার্থনা করলে তিনি তাকে ক্ষমা করে দেন। তাকে হত্যা করেন না। যদি এ কথার উপর তুমি আস্থাশীল না হও তাহলে যেখানে খুশী গিয়ে প্রাণ রক্ষার চেষ্টা করতে পার।''

এরপর দু' ভাইয়ের মধ্যে পত্রালাপ চলতে থাকে এবং ক্রমে ক্রমে কা'বের নিকট পৃথিবীর পরিসর সংকীর্ণ মনে হতে থাকে। এমনকি তার নিকট নিজের জীবনের ফুল নিক্ষিপ্ত হতে দেখা গেল- এ কারণে অবশেষে সে মদীনায় আগমন করল এবং জুহাইনা গোত্রের এক ব্যক্তির মেহমান হিসেবে আশ্রয় গ্রহণ করল। অতঃপর তার সঙ্গে ফজরের সালাত আদায় করল। ফজরের সালাত হতে ফারেগ হওয়া মাত্রই জুহাইনা গোত্রের লোকটি তাঁকে ইঙ্গিত করলে তিনি উঠে গিয়ে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট উপবিষ্ট হলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁকে চিনতেন না। তিনি বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল (ﷺ)! কা'ব বিন জুহাইর তওবা করে মুসলিম হয়েছেন এবং

আপনার নিকট ক্ষমা ও আশ্রয় প্রার্থনা করছেন। আমি যদি তাঁকে আপনার খিদমতে হাজির করি তাহলে আপনি কি তাঁকে আশ্রয় প্রদান করবেন?

নাবী কারীম (ﷺ) বললেন, 'হ্যাঁ' অতঃপর তিনিই বললেন, 'আমি হচ্ছি কা'ব বিন জুহাইর'। এ কথা শুনে একজন আনসারী সাহাবী তাকে হত্যা করার জন্য লাফ দিয়ে ওঠেন এবং তাঁর গ্রীবা কর্তন করার জন্য অনুমতি চান। নাবী কারীম (ﷺ) বললেন,

(دَعْهُ عَنْكَ، فَإِنَّهُ قَدْ جَاءَ تَائِباً نَازِعاً عَمَّا كَانَ عَلَيْهِ)

অর্থঃ ক্ষান্ত হও, এ ব্যক্তি তাওবা করেছে, এবং তাওবা করার কারণে সমস্ত দোষত্রুটি থেকে সে মুক্তি লাভ করেছে।' এ সময়েই কা'ব বিন জুহাইর তাঁর একটি প্রসিদ্ধ কবিতা পাঠ করে নাবী কারীম (ﷺ)-কে শোনাল যার প্রথম পংক্তিটি এখানে লিপিবদ্ধ করা হল,

بانت سعاد فقلبي اليوم مَتْبُول ** مُتَيَّمٌ إِثْرَهَا، لم يُفْدَ، مَكْبُول

অর্থ : 'সু'আদ চলে গেছে, বিরহ ব্যথায় আমার অন্তর বিদীর্ণ, আমি বন্দী শৃঙ্খলাবদ্ধ আমার মুক্তিপণ দেয়া হয়নি। এ কবিতাতেই কা'ব রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর প্রশংসাসহ তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে নিম্নোক্ত লাইনগুলো আবৃত্তি করেন,

انبئت أن رسول الله أوعدني ** والعفو عند رسول الله مأمولمهلا
هداك الذي أعطاك نافلة الـ ** قرآن فيها مواعيظ وتفصي
لا تأخذن بأقوال الوشاة ولم ** أذنب، ولو كثرت فيَّ الأقاويل
لقد أقوم مقاما ما لو يقوم به ** أرى وأسمع ما لو يسمع الفيل
لظل يرعد إلا أن يكون له ** من الرسول بإذن الله تنويل
حتى وضعت يميني ما أنازعه ** في كف ذي نقمات قيله القيل

অর্থ : আমি সংবাদ পেয়েছি যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাকে ধমক দিয়েছেন, কিন্তু রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট ক্ষমার আশা করা হয়। আপনি অপেক্ষা করুন। যে আল্লাহ আপনাকে হিদায়াতপূর্ণ কুরআন দিয়েছেন, তিনি আপনাকে হিদায়াতের কাজে সাফল্য দান করুন। (নিন্দুকদের কথায়, কান দিবেন না) যদিও আমার সম্পর্কে অনেক কথাই বলা হয়েছে, কিন্তু আমি কোন অপরাধ করিনি। আমি এমন এক জায়গায় দন্ডায়মান আছি, আমি সেই কথাই শুনেছি এবং দেখেছি যে হাতীও যদি সেখানে দাঁড়ায় এবং সেই কথাগুলো শুনে তাহলে কম্পিত হবে। এ অবস্থা ব্যতীত যে তার উপর আল্লাহর অনুমতিতে রাসূল (ﷺ)-এর মেহেরবানী হয়। এমন কি আমি নিজ হাত কোন দ্বিধা ছাড়াই এমন এক সম্মানিত ব্যক্তির হাতে রেখেছি যাঁর প্রতিশোধ নেয়ার পূর্ণ ক্ষমতা রয়েছে এবং যার কথাই আসল কথা যখন আমি তাঁর সঙ্গে কথা বলছি।

إن الرسول لنور يستضاء به ** مهند من سيوف الله مسلول

অর্থ : নিশ্চয়ই রাসূল আলোকস্বরূপ, তাঁর দ্বারা অন্ধকার দূর হয়। কোষমুক্ত হিন্দুস্থানী ধারালো তলোয়ার)

এরপর কা'ব বিন জুহাইর কুরাইশ মুহাজিরগণের প্রশংসা করেন। কারণ, কা'বের আগমনে তাদের কোন ব্যক্তি ভাল উক্তি ছাড়া কোন মন্তব্য করে নি এবং কোন গতিভঙ্গীও পরিলক্ষিত হয়নি। কিন্তু তাদের প্রশংসা কালে আনসারদের প্রতি তিনি কটাক্ষ করেন। কারণ তাঁদের একজন তার গ্রীবা কর্তনের অনুমতি চেয়েছিল। কাজেই তিনি বললেন,

يمشون مَشْيَ الجمال الزُّهْرِ يعصمهم ** ضَرْبٌ إذا عَرَّد السُّودُ التَّنَابِيل

অর্থ : ওরা (কুরাইশগণ) সুশ্রী উটের ন্যায় হেলে দুলে চলেন। অসিযুদ্ধ তাদের রক্ষা করে যখন কদাকার কুৎসিত লোকেরা রাস্তা ছেড়ে পলায়ন করে।

কিন্তু ইসলাম গ্রহণের পর যখন তাঁর ঈমান দৃঢ় হয় তখন আনসারদের প্রশংসাসূচক একটি কবিতা আবৃত্তি করেন এবং তাঁদের ব্যাপারে তাঁর যে ত্রুটি হয়েছিল তার তিনি সংস্কার করে নেন। এ কবিতাটি নিম্নে লিপিবদ্ধ করা হল:

من سره كَرَمُ الحـياة فلا يَزَلْ ** في مِقْنَبٍ من صالحي الأنص
ورثوا المكارم كابراً عن كـابر ** إن الخـيار هـم بنـو الأخيا

অর্থ : ভদ্রোচিত জীবন যাপন যার পছন্দনীয় হয় তিনি সর্বদাই সৎ সাহায্যকারীদের দলভুক্ত হয়ে থাকেন। তার ভাল স্বভাবগুলো পিতা এবং পূর্বের পিতৃপুরুষগণের নিকট হতে প্রাপ্ত হয়েছে। প্রকৃতই ভাল লোক ভাল লোকেরই সন্তান হয়।

মৃত্যুঃ আরবের প্রজ্ঞাময় কবি কায়াব ইবনে যুহাইর **২৪ হিজরীতে** মৃত্যুবনণ করেন।

আহমাদ শাওকী (১৯৬৮-১৯৩২)

পরিচিতি ও জন্মঃ কবি আহ্মাদ শাওকী সেই পাঁচজন কবির মধ্যে শীর্ষস্থানীয় যাঁদের হাতে আধুনিক আরবী কাব্য সাহিত্য প্রতিপালিত হয়েছে এবং যাঁদের হাত ধরে আরবী কবিতা পূর্ণতা লাভ করেছে। তাঁর নাম আহ্মাদ শাওকী। তিনি আমীরুশ্ শু'আরা (আধুনিক কবি-সম্রাট) উপাধিতে ভূষিত। ১৮৬৮ সালে ১৬ই অক্টোবর মিসরের রাজধানী কায়রোতে তাঁর জন্ম। তাঁর পিতা আরবীয়, মাতা তুর্কীশ, পিতামহী কুর্দিশ এবং মাতামহী গ্রীক বংশোদ্ভূত। এভাবে চারটি পৃথক সংস্কৃতি তাঁর ধমনীতে প্রবাহিত হয়েছিল। শিক্ষা জীবনঃ চার বছর বয়সে তাঁকে কুত্তাবুশ্ শায়েখ সালেহ নামক মক্তবে ভর্তি করা হয়। অতঃপর মাদ্রাসাতুল্ মুব্তাদিয়ান এবং মাদ্রাসাতুত্ তাজ্হিযিয়্যাহ্তে পাঠ গ্রহণ করেন। তারপরে আইন মহাবিদ্যালয়ে ভর্তি হন। দু' বছর পর অনুবাদ বিভাগ হতে ফরাসী ভাষা শেখেন এবং এ বিষয়ে সনদ অর্জন করেন। ১৮৮৭-তে আইন ও সাহিত্য অধ্যয়নের জন্য তিনি পর্যায়ক্রমে ফ্রান্সের মনপালিয়া ও প্যারিস যাত্রা করেন। ১৮৯১ সালে ইস্তানবুল হয়ে মিসর প্রত্যাবর্তন করেন। দরবারী কবিঃ ফিরে এসে তিনি শাসক 'আব্বাস হিল্মীর নৈকট্য লাভ করেন। দিনের পর দিন তাঁদের বন্ধুত্ব দৃঢ় হতে থাকে। এভাবে তিনি শাসকের কবি ও মুখপাত্রে পরিণত হন। ১৯৮৪ সালে জেনেভায় অনুষ্ঠিত প্রাচ্যবিদদের আন্তর্জাতিক কনফারেন্সে মিসরের প্রতিনিধিত্ব করেন। সেখানে তিনি তাঁর বিখ্যাত কবিতা "কেবারুল্ হাওয়াদিস ফী ওয়াদিন্ নীল" আবৃত্তি করেন।

নির্বাসনেঃ

১৯১৫ সালে যখন ইংরেজরা খিদিভ ‘আব্বাসকে ক্ষমতাচ্যুত করল প্রথম বিশ্ব যুদ্ধে জার্মানি ও তুরস্ককে সমর্থন করার অজুহাতে এবং তাঁর পরিবর্তে হুসাইন কামিলকে সিংহাসনে বসালো কবি প্রকাশ্য এর বিরোধিতা করলেন। ফলে তাঁকে দেশ থেকে নির্বাসিত করা হল। তিনি স্পেনের বার্সিলোনায় চলে গেলেন। সেখানেই নির্বাসনের পাঁচ বছরের (১৯১৫ – ১৯১৯) অতিবাহিত করলেন। জাতির কবিঃ ১৯২০-তে দেশে ফিরে তদানীন্তন মিসরের রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনে অংশ গ্রহণ শুরু করেন। রাজনৈতিক সংস্কার, জাতীয় সমস্যাসমূহের সমাধান ও আর্থসামাজিক অবস্থার পরিবর্তনের ব্যাপারে সরব হন। অতঃপর ১৯২৪ সালে তাঁকে মাজ্‌লিসুশ্‌ শুয়ূখ (আমাদের রাজ্যসভার মতো একটা সংসদীয় কমিটি)-এর সদস্য করা হয়। ১৯২৭ সালে কায়রোর অপেরা হাউসে অনুষ্ঠিত কাব্য মেলায় আরব বিশ্বের কবি-বিদ্বান ও রাজনীতিবিদদের উপস্থিতিতে তাঁকে আমীরুশ্‌ শু‘আরা (আধুনিক যুগের কবি-সম্রাট) উপাধিতে ভূষিত করা হয়। এই বিরল প্রতিভাধর ব্যক্তিত্বটি ১৯৩২-এর ১৪ই অক্টোবর কায়রোয় মৃত্যু বরণ করেন।

তাঁর রচনাসমূহঃ

তাঁর কবিতার সংকলনটি “আশ্‌-শাওকিয়্যাত” নামে চার খণ্ডে প্রকাশিত। এছাড়া “আস্‌ওয়াকুয্‌ যাহাব” তাঁর সামাজিক প্রবন্ধসমূহের সংকলন। তিনি ছয়টি কাব্যনাট্য রচনা করেছেন। যথা– মাস্‌রা‘উ কালিউবাত্‌রা, মাজ্‌নূনু লায়লা, কাম্‌বীয, ‘আলী বিক আল্‌-কাবীর, ‘আন্‌তারাহ্‌, আস্‌-সিত্‌তু হুদা। তাঁর লেখা তিনটি উপন্যাস হল– ‘আয্‌রাউল্‌ হিন্‌দ, লাদিয়াস, ওয়ারাকাতুল্‌ আস। তাঁর কাব্য প্রতিভাঃ আব্বাসী কবি আল্‌-মুতানাব্‌বীর পরে তাঁর মতো প্রতিভাধর কবি আর একটাও জন্মায়নি। তাঁর প্রাচীন ও নব্য রচনা শৈলীর মিশ্রণে এক অভিনব ও নতুন কাব্য রীতির প্রবর্তন, ভাষার সাবলীলতা, উপস্থাপনের মাধুর্য, বিষয়বস্তুর আবেদন পাঠক মনকে বিমোহিত করে। তাঁর কবিতার মূল উপজীব্য হল দেশ প্রেম, ধর্ম প্রীতি, স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা এবং জীবনের মায়া। তিনি নবী (সাঃ)-এর প্রশংসায় রচিত তাঁর বিখ্যাত আল্‌-হামাযিয়্যাতুন্‌ নাবাবিয়্যাহ্‌ কবিতার সূচনায় বলেছেন–

وُلد الهـدى فالكائنات ضيـاء وفـم الـزمـان تبسـم وثنـاء

(পথপ্রদর্শক জন্মেছেন। তাই নিখিল বিশ্ব আলোয় ঝলমল করছে। সময়ে মুখে হাসি ও বন্দনার ধ্বনি।) তাঁর এক কবিতায় শিক্ষক সমাজের ভূয়সী প্রশংসা করে বলেছেন–

قـم للمعـلم وفـه التبجيـلا كـاد المعلم أن يكون رسولا

(দাঁড়িয়ে পড়ো, শিক্ষককে পূর্ণ রূপে সম্মান করো। কারণ শিক্ষকেরা হচ্ছেন প্রায় নবী-রসূলদের মতো।) দামেস্কের প্রশংসায় রচিত কবিতার সূচনায় তিনি বলেছেন–

آمنت بالله واستثنيت جنتـه دمشق روح وجنات وريحـان

আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান এনেছি, তাঁর তৈরি স্বর্গকে আলাদা রেখে বলছি, দামেশকাস হচ্ছে প্রাণ, কোমল বাতাস ও সুগন্ধিতে ভরা একটা স্বর্গ।

কবি নাজিব মাহফুজের জীবনী ও কর্ম (১৯১১-২০০৬)

নাগিব মাহফুজ(আরবি: نجيب محفوظ) (জন্ম: ডিসেম্বর ১১, ১৯১১ - মৃত্যু: আগস্ট ৩০, ২০০৬) নোবেল বিজয়ী মিশরীয় সাহিত্যিক। নাগিব মাহফুজ ১৭ বছর বয়স থেকে লেখালেখি শুরু করেন। ১৯৩৯ সালে তার প্রথম উপন্যাস প্রকাশিত হয়। জীবদ্দশায় ৩০টি উপন্যাস লিখেলও ১৯৫৫ থেকে ১৯৫৭ সালের মধ্যে প্রকাশিত কায়রো ট্রিলজি তাকে আরব সাহিত্যের এক অনন্য উচ্চতায় তুলে ধরেন। এতে তিনি ইংরেজ শাসন থেকেমুক্ত হওয়ার সময়কালে মিশরের ঐতিহ্যবাহী শহুরে জীবনধারা ফুটিয়ে তোলেন । এ উপন্যাসের স্বীকৃতি স্বরূপ তিনি ১৯৮৮ সালে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পান। নাগিব মাহফুজের উপন্যাসের প্রায় অর্ধেকেরও বেশীর চলচ্চিত্রায়ন হয়েছে। উপন্যাসের পাশাপাশি তিনি ১০০ টিরও বেশি ছোটগল্প রচনা করেছেন। এগুলির বেশীর ভাগই পরে ইংরেজিতে অনুদিত হয়েছে। আরবী উপন্যাসের রাজকুমার নাজিব মাহফুজ ।

জন্ম-১১ ডিসেম্বর ১৯১১ কায়রো, মিশর

মৃত্যু- ৩০ আগস্ট ২০০৬ (বয়স ৯৪)

সমাধিস্থল-মিশর
পেশা-ঔপন্যাসিক
ভাষা-আরবী
জাতীয়তা-মিশরীয়

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান- কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়

সময়কাল- ১৯৩২-২০০৪

বিষয়- মিশরীয় জীবনধারা সাহিত্য আন্দোলন বাস্তবমুখী সাহিত্য

উল্লেখযোগ্য রচনাবলি- মিদাক গলি, কায়রো ট্রিলজি , আমাদের প্রতিবেশী

উল্লেখযোগ্য পুরস্কার- ১৯৮৮ সালে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ ১৯৬০ এর দশকে মাহফুজ

প্রাথমিক জীবন ও শিক্ষা :

নাজিব মাহফুজ মধ্যবিত্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার পরিবার কঠোর ইসলামি অনুশাসন মেনে চলত। তিনি একজন লেখক হবেন তা কল্পনাতেও ভাবেন নি।"

মাত্র সাত বছর বয়সে তিনি মিশরীয় বিপ্লবে ১৯১৯ অংশ গ্রহণ করেন। তার উপর একটি বড় প্রভাব পরে। ব্রিটিশ সৈন্যদের তিনি খুব কাছ থেকে প্রায়ই বিক্ষোভকারী ঈমানদার নারী ও পুরুষদের উপর অগ্নিসংযোগ করতে দেখেন। তার প্রথম দিকের বছর গুলোতে, মাহফুজ নিষ্পাপ নিষ্কলঙ্ক ও হাফিজ নাজিব দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন।

তার মাধ্যমিক পরীক্ষার পরে, তিনি দর্শন বিভাগে ১৯৩০ সালে ভর্তি হন মিশরীয় বিশ্ববিদ্যালয় (বর্তমানে কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়)। ১৯৩৪ সালে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন। এর পর ১৯৩৬ সালে দর্শনের গবেষণা কাজে একটি বছর অতিবাহিত করেন। পরে তিনি

গবেষণা পরিত্যাগ করেন এবং একটি পেশাদার লেখক হয়ে যান। মাহফুজ তারপর আল-রিসালায়ের জন্য একজন সাংবাদিক হিসেবে কাজ করেন, এবং এল-হিলাল এবং আল-আহরাম ছোটোগল্প লিখতে অবদান রাখেন।

আরবি ভাষার কিংবদন্তি ঔপন্যাসিক নাজিব মাহফুজ। **১৯৮৮ সালে সাহিত্যে বিশেষ অবদানের জন্য পেয়েছেন নোবেল পুরস্কার**। আরব লেখকদের মধ্যে তিনিই প্রথম ও সাহিত্যে একমাত্র নোবেল বিজয়ী। আরবি সাহিত্যে যেসব লেখক অস্তিত্ববাদ নিয়ে লেখালেখি শুরু করেন, তাদের মধ্যে তিনি অন্যতম। আরব বিশ্ব ছাড়িয়ে তিনি অবস্থান করে নিয়েছেন বিশ্বের অন্যতম সেরা সাহিত্যিকদের তালিকায়।

বিশ্বব্যাপী প্রভাবশালী এই আধুনিক ঔপন্যাসিকের জন্ম মধ্যপ্রাচ্যের দেশ **মিশরে ১৯১১ সালের ১১ ই ডিসেম্বর কায়রোর আল-জামালিয়া গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন।** তার বয়স যখন ১৩ বছর, তখন তার বাবা তার জন্মস্থান আল-জামালিয়া থেকে স্থানান্তরিত হয়ে আল-আব্বাসিয়া গ্রামে চলে যান। তারা বহু বছর সেখানে বসবাস করেন। পিতার মৃত্যুর পরও নাজিব মাহফুজ তার মাকে নিয়ে সেখানে অনেকদিন বসবাস করেন। তারপর তিনি চলে আসেন পুরনো কায়রোর আল-আজহার এলাকায়।

নাজিব মাহফুজ ছাত্রাবস্থা থেকেই দর্শনের প্রতি অনুরাগী ছিলেন। ১৯৩৪ সালে তিনি বর্তমান কায়রো বিশ্ববিদ্যালয় বা তৎকালীন ফুয়াদ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন। পাশাপাশি তিনি ছিলেন সাহিত্যের একজন গভীর পাঠক। ছাত্রজীবনে ইংরেজি এবং ফরাসি ভাষায় রচিত বহু গ্রন্থ তিনি গভীর আনন্দের সাথে পড়েন। বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র থাকাকালীনই তিনি তিনটি ছোট আকৃতির ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখে ফেলেন। **তিনি ১৭ বছর বয়সে লেখালেখি শুরু করেন। তার লিখিত প্রথম উপন্যাস প্রকাশিত হয় ১৯৩৯ সালে।** তবে লেখালেখির শুরুতেই খ্যাতি পেয়ে জাননি, করতে হয়েছে অনন্য সাধনা। প্যারিস রিভিউতে প্রকাশিত এক সাক্ষাৎকারে তিনি তার লেখালেখি শুরুর গল্প বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন-

১৯২৯ সালে আমার লেখালেখির যাত্রা শুরু। তখন আমার সবগুলো গল্প প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল। মাজাল্লার সম্পাদক সালামা মুসা বলতেন, "তুমি সম্ভাবনাময়, কিন্তু এখন পর্যন্ত ভালো কিছু লিখতে পারনি।" ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বরের কথা আমার বিশেষভাবে মনে পড়ে, কারণ সেটা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শুরু, হিটলার পোল্যান্ড আক্রমণ করলেন। আমার গল্প 'আবাছ আল-আকদার' পত্রিকায় ছাপা হলো, সেটা আমার জন্য মাজাল্লা প্রকাশকদের পক্ষ থেকে একধরনের অপ্রত্যাশিত উপহার ছিল। সেটা আমার জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।

১৯৫২ সালের জুলাই মাসে সংগঠিত মিসর বিপ্লবের আগে তার প্রায় ১০টি বই প্রকাশিত হয়। এই বিপ্লবে তার লেখালেখি বিশেষ ভূমিকা পালন করে। এরপর তিনি বেশকিছু বছর তার লেখালেখি বন্ধ রাখেন। **১৯৫৭ সালে প্রকাশিত হয় তার বিখ্যাত উপন্যাস 'কায়রো ট্রিলজি**,' যা তাকে সারাবিশ্বে পরিচিত করে তোলে। **তার লিখিত মোট উপন্যাসের সংখ্যা ৩৪টি, ছোটগল্পের সংখ্যা ৩৫০টি।** এছাড়াও লিখেছেন **৫টি নাটক** এবং অনেকগুলো চলচ্চিত্রের চিত্রনাট্য। তার লিখিত অনেক গল্প নিয়ে মিসরে ও বিভিন্ন দেশে নির্মিত হয়েছে চলচ্চিত্র।

নাগিব মাহফুজ তার সাহিত্য সাধনার প্রথম দশ বছর যে কয়েক ডজন ছোটগল্প রচনা করেছেন, তার অধিকাংশই শহুরে জীবনের নানা অন্ধকার দিক নিয়ে লিখিত এবং তার গল্পের

অনেক চরিত্রই সরাসরি জীবন থেকে নেয়া। ফলে অতি দ্রুত সময়ে তিনি পাঠকদের হৃদয়ে জায়গা করে নেন। **১৯৪৫ থেকে ১৯৫৭ সালের মধ্যে** তার যে উপন্যাসগুলো প্রকাশিত হয়, তা সাধারণভাবে বাস্তবতাবাদী বলে অভিহিত হয়। এসব উপন্যাসের মধ্যে **'আল-খলিলি', 'মাইদাক গলি', 'মরীচিকা', 'শুরু এবং শেষ' ও 'কায়রো ট্রিলজি' বিশেষভাবে বিখ্যাত। ১৯৫৯ সালে প্রকাশিত 'গেবেলাউইর শিশুরা'** দিয়ে তার লেখালেখিতে পরিবর্তন আসে। রূপক ও প্রতীকধর্মী রাজনৈতিক বিষয়াদি এ সময়ে তিনি তার লেখায় তুলে ধরেন। লেখায় দার্শনিক ও জটিল মনস্তাত্ত্বিক বিষয়সমূহ প্রাধান্য পেতে শুরু করে। **'গেবেলাইর শিশুরা' গ্রন্থটি একইসাথে বিখ্যাত এবং বিতর্কিত।** নিজ দেশ মিশরে আজও বইটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়নি। ১৯৬৭ সালে লেবানন থেকে সর্বপ্রথম বই আকারে প্রকাশিত হয় এই উপন্যাসটি। ১৯৮১ সালে উপন্যাসটির আরবি থেকে ইংরেজিতে অনুবাদ করেন ফিলিপ স্টুয়ার্ট। এ সময়ে প্রকাশিত তার উল্লেখযোগ্য অন্যান্য উপন্যাস হচ্ছে, **'চোর ও কুকুর', 'শরতের কয়লা', 'নীলের ছোট ছোট কথা', 'মিরামার'** ইত্যাদি।

"সময় এক ভয়ঙ্কর সহযাত্রী", 'সময় আমার বন্ধুর অবস্থা এ কী করেছে? তার মুখে একটি বীভৎস মুখোশ এঁটে দিয়েছে!" 'বাসরগীতি' উপন্যাসে আমরা দেখি কাল কীভাবে এবং কতভাবে ভয়ঙ্কর রূপান্তর সাধন করে। প্রেম রূপান্তরিত হয় ঘৃণায়, সুন্দর হয়ে ওঠে কুৎসিত, বিশ্বস্ততা ও আনুগত্যের জায়গায় আসে লাম্পট্য। এর চিহ্ন আমরা দেখি তারিক রামাদান, করম ইউনিস, হালিমা, আব্বাস, এমনকি যে বাড়িতে আব্বাস বড় হয়ে উঠেছে, তার মধ্যেও। 'বাসরগীতি' মাহফুজের সব উপন্যাসের মতোই কালের একটি দর্পণ এবং সেই সময়ের চরিত্রাবলীর উপর তার যে প্রভাব পড়েছে, সে ইতিহাস। এ কাজটি করার জন্য মাহফুজ গতানুগতিক বর্ণনার দ্বারস্থ হন না। তিনি চরিত্রগুলোর শারীরিক বর্ণনা দানের চাইতে অধিকতর মনোযোগ দেন তাদের অন্তরের হতাশা, ক্ষোভ ও যন্ত্রণা ফুটিয়ে তোলার প্রতি। আর সে উদ্দেশ্যে তিনি ব্যবহার করেন চেতনার অন্তঃশীলা প্রবাহের আঙ্গিক এবং অভ্যন্তরীণ একক কথন, স্ট্রিম অব কনশাসনেস টেকনিক এবং ইন্টেরিয়র মনোলগ। এ উপন্যাসের প্রতিটি প্রধান চরিত্র তার নিজের জবানিতে নিজের কথা বলে, ঘটনার নিজস্ব ব্যাখ্যা দেয় এবং এভাবে জীবনের বাস্তব কাঁচামাল থেকে নিজস্ব নাটক নির্মাণ করে।

৪৩ বছর বয়স পর্যন্ত অবিবাহিত ছিলেন নাগিব মাহফুজ। তার আশঙ্কা ছিল, যদি বিয়ে করে সংসার নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েন, তাহলে লেখালেখির ক্ষতি হবে। কিন্তু সেই আশঙ্কাকে পাশে রেখে **১৯৫৪ সালে আতিয়াতাল্লাহ ইব্রাহিম নামের এক নারীকে বিয়ে করেন নাগিব মাহফুজ।** তাদের সংসারে দুটি কন্যাসন্তানের জন্ম হয়। তবে তিনি তার নিজের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে সব সময়ই খুব অন্তর্মুখী ছিলেন ও একা থাকতে ভালোবাসতেন। প্যারিস রিভিউকে দেয়া সাক্ষাৎকারে তাই তিনি নিজেই বলেছেন-আমি কখনো ডিনার পার্টি বা সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে যেতে চাই না। এমনকি আমার বন্ধুদের বাড়িতেও ঘুরতে যাই না। আমি তাদের সঙ্গে দেখা করি ক্যাসিনো কাসর আল-নীল অথবা কোনো কফি হাউজে।

১৯৭২ সাল পর্যন্ত নাগিব মাহফুজ সরকারি চাকরিতে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি প্রথমে কাজ করেন মিনিস্ট্রি অব এনডাউমেন্টে। এরপর কাজ করেন ব্যুরো অব আর্টের সেন্সরশিপ ও ফাউন্ডেশন ফর দ্য সাপোর্ট অব দ্য সিনেমার পরিচালক হিসেবে। এবং সর্বশেষ সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের কালচারাল অ্যাফেয়ার্সের উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করেন। চাকরি ছাড়ার পরে নিয়মিত কলাম লিখতেন বিভিন্ন প্রভাবশালী পত্র-পত্রিকায়। তবে **বেশি লিখতেন আল**

আহরাম পত্রিকায়। এসব কলাম নিয়ে পত্রিকাটি ২০০১ সালে একটি বইও বের করে। **প্রায় ৭০ বছর লেখালেখিতে সক্রিয় থাকা এ মহান সাহিত্যিক ২০০৬ সালের ৩০ আগস্ট কায়রোয় মৃত্যুবরণ করেন**। **মৃত্যুর সময় তার বয়স হয়েছিল ৯৪ বছর**। এ দীর্ঘ জীবনে তিনি আরবি সাহিত্যকে তুলে ধরেন বিশ্বদরবারে।

*** আরবি সাহিত্যের বিকাশ *.....**

ইংরেজি সাহিত্যের প্রাচীন যুগ ধরা হয় ৪৫০ থেকে ১০৬৬ সালকে। যদি "বেওউল্ফ" কে ইংরেজি সাহিত্যের আদি নিদর্শন মনে করা হয় যেটা লেখা হয়েছে ৮ম হতে ১১শ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে। কিন্তু সর্বজন পঠিত সাহিত্যের ধারাবাহিতার জন্য অপেক্ষা করতে হয় জিওফ্রে চসার (১৩৪০- ১৪০০) পর্যন্ত। মূলত চসার পরবর্তী ইংরেজি সাহিত্যকে মূল ধারার ইংরেজি সাহিত্য বলা যেতে পারে। আমাদের বংলা সাহিত্যের প্রাচীন যুগ ধরা হয় ৬৫০ হতে ১২০০ সাল অব্দি সময়কে। বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন 'চর্যাপদ' এই সময়ের মধ্যে লেখা হয়েছে বলে ধারনা করা হয়। কিন্তু বাংলা সাহিত্যের ধারাবাহিতার সূত্রপাত হয় বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগে, বিশেষত ১৩৫০ সালের পর। আরবি সাহিত্যের প্রাচীন যুগের ব্যাপ্তি ৪৫০ হতে ৬২২ সাল পর্যন্ত। সাহিত্য সৃষ্টির সময় বিচারে তিনটি ভাষাই সমসাময়িক। কিন্তু ৪৫০- ৬২২ সালে আরবি ভাষার সাহিত্য যে শিল্পমান অর্জন করেছিল ইংরেজি ভাষা সেই পর্যায়ে পৌছাতে পেরেছিল ১৩৫০সালের পর।

আরবি সাহিত্য বিকাশের ইতিহাসকে ছয়টি যুগে ভাগ করা হয়ে থাকে –

১.জাহেলী যুগ- (৪৫০ - ৬২২)সাল

২.ইসলামী যুগ- (৬২২ - ৬৬১)সাল

৩.উমাইয়া যুগ-(৬৬২- ৭৫০) সাল

৪. আব্বাসী যুগ-(৭৫০-১২৫৮) সাল

৫. ওসমানী যুগ-(১২৫৯ - ১৭৯৭) সাল

৬. আধুনিক যুগ - (১৭৯৮- বর্তমান)

তবে অনেকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করে উমাইয়া যুগকে ইসলামী যুগের অংশ হিসেবে দেখিয়েছেন। অনেক সাহিত্যবিশারদ ওসমানী যুগকে 'পতনের যুগ' নামেও অভিহিত করে থাকেন।

উটের চালকেরা দীর্ঘ যাত্রার ক্লান্তি দূর করতে 'হুদা' নামে এক প্রকার ছন্দবদ্ধ গান গাইতেন, ধারনা করা হয় সেখান থেকেই আরবি ছন্দের উৎপত্তি। জাহেলী আরবদের এই ছন্দ লিখে সংগ্রহ করার কোন পন্থা ছিল না। মনে করা হয় জাহেলী যুগের আগেই আরবি মৌখিক সাহিত্যের বিকাশ হতে পেরেছিল। জাহেলী যুগে কাব্যচর্চার তীর্থস্থান ছিল 'ওকাজের মেলা'। সেখানে কাব্য প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হতো এবং শ্রেষ্ঠ কবিতাটি সোনালী হরফে লিখে কা'বা শরীফের দেয়ালে ঝুলিয়ে দেয়া হতো। ঝুলানো এই সব কবিতা "মুয়াল্লাকা" নামে পরিচিত। আরবি সাহিত্যে এখন পর্যন্ত মুয়াল্লাকার কবিতা ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়ে থাকে।

জাহেলী যুগের (৪৫০- ৬২২) কবিদের মধ্যে বিখ্যাত ছিলেন আমর বিন কুলসুম, আনতারাহ্, লবীদ বিন রাবিয়া, তুরাফ বিন আবদ, যুহাইর বিন আবী সালমা প্রমুখ। তবে জাহেলী যুগের সবথেকে প্রসিদ্ধ কবি ছিলেন ইমরুউল কায়েস।জাহেলী কাব্যের বিষয়বস্তু ছিল প্রেম, বিরহ,বীরত্বগাঁথা, শোকগাঁথা ও কুৎসা। এক কথায় মানবীয় অনুভূতির প্রকাশ। প্রাচীন আরবি সাহিত্যে নারীদের সাহিত্য রচনা করতে দেখা গেছে। প্রসিদ্ধ ছিলেন খানসা রা:, এবং লায়লা আফিফাহ্ নামের দুজন মহিলা কবি। প্রাচীন আরবি সাহিত্যের অন্য একটি সমৃদ্ধ দিক ছিল প্রবাদ প্রবচন।

ইসলাম আবির্ভাবের পর আরবি সাহিত্য পায় এক নতুন মাত্রা। কুরআনের ভাষার প্রাঞ্জলতা আরবি ভাষাকে দেয় নতুন গতি। এই যুগের কবিতায় নতুন বিষয় হিসেবে যোগ হয় রাসূল সাঃ কে নিয়ে স্তুতিকাব্য। প্রেম, বিরত্বের কবিতাও লেখা হতে থাকে সমান তালে। তবে জাহেলী যুগের কবিরা যেমন কবিতায় শ্লীলতার কোন ধার ধারতেন না, ইসলামি যুগে সেখানে কিছুটা পরিমার্জন পরিলক্ষিত হয়। জীবনাচারে পরিবর্তন কবিতায় পরিবর্তন আনে। উমাইয়া যুগের (৬৬২ - ৭৫০) সাহিত্যধারা ইসলামি যুগের সাথে অনেকটা একই। এই যুগে গদ্য সাহিত্যেরও বিকাশ ঘটে। বিশেষত 'খুতবাহ্' বা বক্তিতা গুলিকে লিপিবদ্ধ করা হয়, যা উৎকৃষ্ট গদ্য হিসেবে বিবেচিত। এছাড়া ইসলামি যুগের সংরক্ষিত চিঠি গুলোও সাহিত্যের মর্যাদা পেয়েছে।বিখ্যাত লেখকদের মধ্যে ছিলেন হাসসান বিন সাবিত, কা'ব বিন যুহাইর, আমার বিন আবি রাবীয়া, জারীর, ফারাযদাক প্রমুখ।

আব্বাসী যুগ (৭৫০- ১২৫৮) ছিল ইসলামি সভ্যতার উৎকর্ষতম সময়। আব্বাসীয়রা গ্রীক, পারস্য এবং ভারতীয় সংস্কৃতির সাথে পরিচিত হয়। মরুচারী আরব্য জীবনের গল্পে আসে নতুনত্ব।অন্য ভাষার সাহিত্য অনূদিত হতে থাকে আরবিতে। আরব্য জীবনের বাইরের পৃথিবীও স্থান পেতে থাকে সাহিত্যে। গদ্য সাহিত্যের ব্যাপকতা লাভ করে এই সময়ে। সাহিত্য এবং জ্ঞান চর্চায় দেয়া হয় রাষ্টীয় পৃষ্টপোষকতা। কিন্তু সেই সময়ের সাহিত্য খুব বেশি সংরক্ষণ সম্ভব হয়নি। মোঙ্গোল আক্রমনে ' বাইতুল হিকমাহ' নামের রাষ্ট্রীয় গ্রন্থগারটি ধ্বংস করে ফেলা হয়। তার সাথে হারিয়ে যায় আরবি সাহিত্যের অনেক অমূল্য গ্রন্থ। এই সময়ের বিখ্যাত সাহিত্যিকরা হলেন - আবু নুওয়াস, আবু তাম্মাম, মুতাব্বানী, বুহতারি, ইবনুর রুমি প্রমুখ।

ওসমানী যুগ (১২৫৯ - ১৭৯৭)কে পতনের যুগ বলা হয়ে থাকে। রাজনৈতিক ভাবে মুসলিমদের কোনঠাসা অবস্থার প্রভাব পড়ে সাহিত্যে। ধর্মীয় ঐতিহ্যের সাথে সাথে তারা হারিয়ে ফেলে সাহিত্যের ঐতিহ্য। সাহিত্যে নতুন কোন ধারার সৃষ্টি করতে পারে নি এই সময়ের সাহিত্যিকরা। তবে সাহিত্য রচনা যে বন্ধ ছিল সেরকম নয়। আগের সাহিত্যধারা অনুসরন করে রচিত হয়েছে সাহিত্য। উল্লেখযোগ্যদের মধ্যে আছেন- ইবনে খাল্লিকান,ইবনে যাইদুন, ইবনে মানযুর ও বুসিরি প্রমুখ।

আধুনিক যুগ (১৭৯৮ - বতর্মান) কে বলা হয় ইসলামি কবিতার রেনেসাঁর যুগ। ৫শ শতকে ইংরেজি সাহিত্যের যখন সূচনাই হয়রি তখন আরবি সাহিত্যের ছিল সংঙঘবদ্ধ রূপ। সেই আরবি সাহিত্য তার ঐতিহ্য হারাতে শুরু করে তের শতকে আব্বাসী খেলাফতের পতনের মধ্যে দিয়ে। আরবি ভাষাভাষি মানুষের বড় অংশই মুসলিম, তাই মুসলিমদের পতনের সাথে আরবি সাহিত্য হয়ে পরে নিষ্ফলা। দীর্ঘ প্রায় ৫০০ বছর পর আরবি ভাষার সাহিত্যে একটা নব জাগরনের সূচনা শুরু হয়। একদল পশ্চিমা শিক্ষায় শিক্ষিত কবি সাহিত্যিক সাহিত্য

রচনায় হাত দেন। তাদের সাহিত্য ছিল আরবি ভাষা ব্যাবহার করে ইংরেজি সাহিত্যের অনুকরণে লেখা। ভাবে - গঠনে পাশ্চাত্য ; মৌলিকতাহীন।

আরবি সাহিত্যের নব যুগের সূচনা হয় কবি মাহমুদ সামী আল বারুদীর হাত ধরে। তিনি প্রাচীন আরবি সাহিত্যের ভাব - আঙ্গিককে আধুনিক অনুসঙ্গের সাথে মিলিয়ে নতুন ধারার সূচনা করেন। ইংরেজি সাহিত্যের প্রভাব থেকে একেবারেই হয়তো মুক্ত নয় তবে একটা নিজস্বতা আছে। পরবর্তীতে আধুনিক আরবি ভাষি অনেক কবি তাকে অনুসরণ করেছেন। ইংরেজি সাহিত্যের রোমান্টিসিজমের ঢেউও লাগে আরবি সাহিত্য, সমসাময়িক অনেক কবি এই ধারাতেও রচনা করেন সাহিত্য। মুক্ত ছন্দের কবিতা, গদ্য কবিতা এবং এপিকধর্মী কবিতাও রচিত হয় আধুনিক আরবি সাহিত্যে। গদ্য সাহিত্যের বিকাশ ঘটে। রচিত হয় উপন্যাস, গল্প, উপকথা, প্রবন্ধ, দর্শন এবং ইতিহাস গ্রন্থ।

আরবি সাহিত্যে ইতিহাস অনেক প্রাচীন। আরবি সাহিত্যের প্রচীন যুগ ছিল বিস্ময় ছড়ানোর মতো সমৃদ্ধ। মধ্যযুগে আরবি সাহিত্য পিছিয়ে পরেছে নানা কারণে। হারিয়েছে কিছুটা ঐতিহ্য। আধুনিক আরবি সাহিত্য অনেকটাই সমৃদ্ধ। পড়বার এবং জানবার মতো অনেক রসদ রেখেছে ছড়িয়ে।

পৃথিবীর ইতিহাস পড়লে আমরা দেখতে পাব- প্রতিটি জাতি বা গোত্রের সাথে জড়িয়ে আছে সাহিত্য, হোক সেটি কোনো গল্প বা কাহিনী, কবিতা বা গান। সেসব সাহিত্য আমাদের ধারণা দেয় তাদের জীবনধারা ও চিন্তাচেতনা সম্পর্কে। এসব কিছু আমাদের জানান দেয় আদিকালে মানুষ কীভাবে তাদের সংস্কৃতি বা ঐতিহ্য রক্ষার জন্য এসবের মাধ্যমে তা সংরক্ষণ করে রেখেছে। আজকের লেখায় আমরা এমনই এক জাতির সাহিত্য সম্পর্কে জানব, যারা কবিতা বা গানের মাধ্যমে নিজেদের সংস্কৃতিকে সংরক্ষণ করে রেখেছে।

পৃথিবীর বুকে আরবরা এমন এক জাতি, যারা যাযাবর হিসেবে পরিচিত হলেও তাদের ইতিহাস অনেক সমৃদ্ধ। যুদ্ধ-বিগ্রহ ছাড়াও তারা যে সাহিত্য সাধনায় সমান পারদর্শী তা তাদের সাহিত্য পড়লেই বোঝা যাবে। প্রথম উল্লেখযোগ্য আরবি সাহিত্য রচিত হয় ৪র্থ থেকে ৭ম শতাব্দীর মধ্যে, যা মধ্যযুগীয় গীতিকবিতার স্বর্ণযুগ হিসেবে পরিচিত। কবিতাগুলো বিশেষ করে ব্যক্তিগত কাসিদা বা ছোট কবিতা, তবে কিছু কিছু ১০০ লাইনেরও বেশি। এসব কাসিদাতে আরবের বিভিন্ন উপজাতি ও বেদুইন জীবন ও প্রেম, লড়াই, সাহস এবং শিকারের বিষয়বস্তুকে ফুটিয়ে তোলে। কবিতাগুলোর কথা রোমান্টিকভাবে উল্লেখ করা হয়নি, বরং কবি সরাসরি কথা বলেছেন প্রকৃতি এবং সৃষ্টিকর্তার শক্তির কথা। সংগ্রহ ও সংকলনের মাধ্যমে কাসিদাগুলো টিকে আছে, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো মু'আল্লাকাত, হামাসা, মুফাদ্দালিয়্যাত এবং কিতাব আল-আগনি।

কবিতা আরবি সাহিত্যের অন্যতম অংশ;

সাহিত্যের এই গৌরবময় যুগে কাব্যই ছিল সাহিত্য-চেতনা প্রকাশের একমাত্র মাধ্যম। 'কাসিদা' (গীতিকবিতা) ছিল একমাত্র নিখুঁত কাব্যিক ধারা। আরবীয় বিভিন্ন উপজাতির আমলে, বিশেষত তাগলিব এবং কিনদা উপজাতির মানুষদের মধ্যেই গীতিকবিতার আবির্ভাব ঘটেছিল। কাসিদাগুলোতে হোমারীয় রচনাশৈলী দেখা গেলেও ছন্দের নিরিখে, জটিলতা ও ব্যাপকতার দিক থেকে সেগুলো ইলিয়াড ও ওডিসিকেও ছাড়িয়ে গিয়েছিল। কাসিদা কয়েকটি সুনির্দিষ্ট নিয়ম অনুসরণ করে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য: গতানুগতিক সূচনা, প্রচলিত গুণবাচক পদ, বক্তব্যের মূল অংশের উপস্থাপনা ও বিষয়বস্তুর সামঞ্জস্য। কবিতার বিষয়বস্তু আবেগে ভরপুর, শক্তিশালী কিন্তু বাহুল্যহীন ভাষায় রচিত। কিন্তু গীতিকবিতাগুলোতে মৌলিক চিন্তা বা চিন্তা-উদ্রেককারী চিত্রকল্পের অভাব লক্ষ্য করা যায়। তাই কবিতার পরিবর্তে বহুক্ষেত্রেই কবিই শ্রদ্ধা ভক্তির পাত্র হয়ে ওঠে। তবে অন্য ভাষায় অনূদিত হলে এসব কবিতার মাধুর্য নষ্ট হয়ে যায়। অধিকাংশ কবিতাতেই ব্যক্তিগত ও বিষয়মুখী উপাদানের উপস্থিতি প্রাধান্য লাভ করে।

ইসলাম-পূর্ব আরবি ভাষার সাহিত্য মু'আল্লাকাত

আরবের প্রথমদিকের উল্লেখযোগ্য আরবি সাহিত্যের কথা বলতে গেলে প্রথমেই যে নামটি উঠে আসবে তা হলো বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ মু'আল্লাকাত। মু'আল্লাকাত হচ্ছে আরবি জাহেলি যুগের এক উল্লেখযোগ্য কাব্য সংকলন। তৎকালীন আরবে উকাজের মেলা খুব প্রসিদ্ধ ছিল। এই মেলায় কবিরা তাদের কবিতা শোনাতেন। যে কবিতাটি সবচেয়ে ভালো হতো, সেই কবিতা সোনার হরফে লিখে পবিত্র মক্কা নগরীর কাবা গৃহের দরজায় টাঙিয়ে দেওয়া হতো। যেহেতু এগুলো টাঙিয়ে রাখা হতো, তাই এর নাম রাখা হয় মু'আল্লাকাত। আরবি এই নামের অর্থ 'দ্য সাসপেন্ডেড ওডেস' (The Suspended Odes) বা 'দ্য হ্যাঙ্গিং পোয়েমস' (The Hanging Poems)।

মু'আলাকাত হচ্ছে সাতটি দীর্ঘ আরবি কবিতা সংকলিত একটি বই। এই বইয়ের বেশ

কয়েকজন প্রসিদ্ধ লেখক হলেন:
ইমরু আল-কাইস
লাবিদ ইবনে রাবিয়া
তারাফা ইবনে আল আবদ
জুহাইর ইবনে আবি সুলমা
আনতারা ইবনে শাদ্দাদ
আমর ইবনে কুলসুম
হারিস ইবনে হিল্লিজা

এই সাতজনের মধ্যে প্রথমজন ছিলেন ইমরু আল-কাইস (মৃত্যু আনুমানিক ৫৪০ খ্রি.), যাকে অনেকে মু'আল্লাকাত কবিদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত বলে মনে করেন। তার জন্ম বা মৃত্যুর সঠিক তারিখ নির্ধারণ করা না গেলেও ধারণা করা হয় ষষ্ঠ শতাব্দীর মাঝামাঝিতে তার কবিতাগুলো লেখা হয়েছিল। ইমরু আল-কাইস ছিলেন দক্ষিণ আরবের কাহতানি গোষ্ঠীর কিনদা সম্প্রদায়ভুক্ত। তিনি ছিলেন প্রাচীনতম চারণকবিদের একজন। এজন্য তাকে আরব কবিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ 'কবিদের আমীর বা রাজপুত্র' বলে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকৃতি জানানো হয়।

ইমরু আল-কাইসের লেখা মু'আল্লাকাতের কবিতার কিছু অংশ;
উমাইয়া শাসনকালের শেষের দিকের আগে মু'আল্লাকাতের কোনো সংগ্রহ প্রকাশ করার চেষ্টা হয়নি। অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে হাম্মাদ আল-রাবিয়াহ্ নামে যে বিখ্যাত মহাকাব্য আবৃত্তিকারের আবির্ভাব ঘটেছিল, তিনিই অন্যান্য অনেক গীতিকবিতার মধ্য থেকে সাতটি উৎকৃষ্ট গীতিকবিতা বেছে নেন এবং তাদের একটি আলাদা বিভাগে সংকলিত করেন। গীতিকবিতার এই সংকলনটি অধিকাংশ ইউরোপীয় ভাষায় অনূদিত হয়েছে।

মুফাদ্দালিয়্যাত ও অন্যান্য
বিখ্যাত সাতটি গীতিকবিতা ছাড়াও ইসলাম-পূর্ব সময়ে আরো একটি কাব্য সংকলনের দেখা পাওয়া যায়। সংকলক আল-মুফাদ্দালি আল দাব্বি (মৃত্যু আনুমানিক ৭৮৫ খ্রিষ্টাব্দ) এর নামানুসারে এই কাব্য সংকলনটির নাম হয়েছে 'আল-মুফাদ্দালিয়্যাত"। এতে স্বল্পখ্যাত কবিদের মোট ১২০টি গীতিকবিতা সংকলিত হয়েছে, এছাড়া আছে কয়েকটি দিওয়ান (কাব্য সঞ্চয়ন) এবং আবু-তাম্মাম (মৃত্যু আনুমানিক ৮৪৫ খ্রিষ্টাব্দ) সম্পাদিত দিওয়ান আল হামাসা ও আল-ইসবাহানি (মৃত্যু আনুমানিক ৯৬৭ খ্রিষ্টাব্দ) রচিত কিতাব আল-আগানি থেকে সংগৃহীত এক বিরাট সংখ্যক অসম্পূর্ণ অংশ ও উদ্ধৃতি।

ইসলাম-পরবর্তী আরবি ভাষার সাহিত্য
আল-কুরআন
আল-কুরআন মুসলমানদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ ও সর্বশেষ আসমানি কিতাব। সর্বশেষ নবী ও রাসুল হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর উপর দীর্ঘ ২৩ বছর ধরে বিভিন্ন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তায়ালা ফেরেশতা হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর মাধ্যমে এই কুরআন অবতীর্ণ করেন।

ইসলামের আবির্ভাবের সাথে সাথে কুরআন অধ্যয়ন ও তেলাওয়াত কেন্দ্রীয় কাজ হয়ে ওঠে। কুরআন ধ্রুপদী আরবিতে রচিত। পরবর্তীতে আরবি সাহিত্যে কুরআনের ধ্রুপদী রূপকে আদর্শ মান ধরে অন্যান্য সাহিত্যকর্ম রচিত হয়েছে। এজন্য ইসলাম-পরবর্তী যুগের সাহিত্যকর্মে কুরআনের প্রভাব দেখা যায়। কুরআন যে সময় অবতীর্ণ হচ্ছিল, ঠিক সেই সময় ও তার আগেও মক্কা ও তার আশপাশে কবিতা লেখার ব্যাপক প্রচলন ছিল। মক্কার বিখ্যাত সব কবি নিজেদের লেখা কবিতা নিয়ে কাবা ঘরের সামনে জড়ো হতো।

পবিত্র কুরআন আরবি সাহিত্যের আদর্শ উৎস;
কুরআনের সূরাগুলোর রয়েছে ছন্দ, যা সুর দিয়ে পড়ার মাধ্যমে হৃদয়ে অদ্ভুত আলোড়ন সৃষ্টি করে। কুরআনের ভাষার অলংকার ও শব্দচয়ন অনন্য। এছাড় কুরআনের ব্যাকরণকে ধ্রুপদী আরবি ভাষার মূল হিসেবে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। তাই আরবি সাহিত্যের মধ্যে কুরআনকে আদর্শ হিসেবে ধরা হয়।

অন্যান্য সাহিত্যের মতো আরবি সাহিত্যেও গদ্য ও কবিতার প্রচলন আছে। সাহিত্যে ব্যবহৃত আরবি শব্দগুলো আদব বা শিষ্টাচার, ভদ্রতা, সংস্কৃতি এবং সমৃদ্ধিকে ফুটিয়ে তোলে। আরবি সাহিত্য সর্বাধিক বিকশিত হয়েছিল ইসলামি স্বর্ণযুগের সময়।

খুলাফায়ে রাশেদীন

খুলাফায়ে রাশেদীন বা ইসলামের প্রথম চার খলিফার সময়ে, অর্থাৎ সপ্তম শতাব্দীতে ইসলামি সাহিত্য হিজাজ এলাকায়, অর্থাৎ মক্কা ও মদিনার মতো শহরগুলোতে ছড়িয়ে পড়ে। এছাড়া দামেস্ক, ইরাক, কুফা ও বসরায় ইসলামি সাহিত্য বিকশিত হতে থাকে। এই সময়ে সাহিত্য, বিশেষ করে কবিতা রচিত হয়েছিল, যা ইসলামের প্রসারে কাজ করে। সাহসী যোদ্ধাদের প্রশংসা করার জন্য বা যুদ্ধে সৈন্যদের অনুপ্রাণিত করার জন্য এবং যারা যুদ্ধে শহীদ হয়েছিল তাদের সম্মানার্থে শোক ও শ্রদ্ধা করার জন্যও কবিতা ছিল। এই সময়ের উল্লেখযোগ্য কবিদের মধ্যে রয়েছেন কাব্ ইবনে জুহাইর, হাসান ইবনে সাবিত এবং নাবিঘা আল-জা'দী। বিনোদনের জন্য কবিতাগুলো প্রায়ই গজল আকারে ছিল। এই ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিরা হলেন জামিল ইবনে মা'মার, লায়লা আল-আখিয়ালিয়া, এবং উমর ইবনে আবি রাবিয়াহ।

উমাইয়া খিলাফত

উমাইয়া সাম্রাজ্য গঠনের পর পরই আরবে কাব্যসৃষ্টির এক নতুন জোয়ার আসে। তবে এই সময় আরব কবিদের মধ্যে রোমান্টিকতার প্রভাব দেখা যায়। তাদের মাঝে প্রেমমূলক কবিতাই বেশি লেখা হয়েছিল। বিখ্যাত 'লায়লি-মজনু' প্রেমকাহিনি এই সময়ে লেখা হয়।

এই সময় ইসলামের ইতিহাসে প্রথম ফিতনা সংঘটিত হয়, যার ফলে মুসলমানদের মধ্যে শিয়া-সুন্নি বিভক্তির সৃষ্টি হয়। এটি আরবি সাহিত্যের উপরও বিরাট প্রভাব নিয়ে আসে। শুরুতে ইসলামি সাহিত্য ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়লেও এই যুগের শুরুতে এর ভিত ভেঙে যায়। ক্ষমতার লড়াই ইসলামি শাসকদের উপজাতিবাদের দিকে পরিচালিত করে। এই সময়ের সাহিত্যগুলোতে রাজনৈতিক দল ও নিজ দলের প্রশংসা ও উপদেশ নিয়ে কবিতা রচনা করা হত। এই যুগের কবিদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য আল-আখতা আল-তাঘলিবি, জারির ইবনে আতিয়াহ, আল-ফারাজদাক প্রমুখ।

আব্বাসীয় খিলাফত আব্বাসীয় যুগকে সাধারণত ইসলামি স্বর্ণযুগ হিসেবে ধরা হয়। এটি উল্লেখযোগ্য সাহিত্য রচনার সময় ছিল। বাগদাদের বায়তুল হিকমাহ বা হাউজ অব উইজডম ছিল। আল-জাহিজ এবং ওমর খৈয়ামের মতো অসংখ্য পণ্ডিত ও কবি এ সময়ের পরিচিত নাম। এক হাজার এক রাতের বেশ কয়েকটি গল্পে আব্বাসীয় খলিফা হারুন আল-রশিদকে দেখানো হয়েছে। বসরার আল-হারিরি ছিলেন এই সময়ের একজন উল্লেখযোগ্য সাহিত্যিক ব্যক্তিত্ব। আব্বাসীয় সাহিত্যের কিছু গুরুত্বপূর্ণ কবি ছিলেন বাশার ইবনে বুর্দ, আবু নুওয়াস, মুসলিম ইবনে আল-ওয়ালিদ।

ওমর খৈয়ামের কবিতার বই 'রুবাইয়াত';

বাগদাদের নতুন আরবি-ফার্সি সংস্কৃতির উত্থানের ফলস্বরূপ ৮ম এবং ৯ম শতাব্দীতে আব্বাসীয়দের সময়ে আরবি সাহিত্যের ব্যাপক জনপ্রিয়তা ও বিস্তার ঘটে। সাহিত্যের পাশাপাশি দর্শন, গণিত, আইন, কোরআনের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ, ইতিহাস এবং বিজ্ঞানের চর্চা করা হয়েছিল এই সময়ে, এবং আরবি কবিতার বইও সংকলিত হয়েছিল।

আবু নুওয়াসের কবিতা
আরব্য রজনীর গল্প আরবি সাহিত্যের সবচেয়ে বিখ্যাত ও বড় সংগ্রহ হলো 'আরব্য রজনীর এক হাজার এক রাত' বা 'থাউজেন্ড অ্যান্ড ওয়ান নাইটস'। এটি আরবিতে 'আলিফ লায়লা ওয়া লায়লা' এবং ইংরেজিতে 'দ্য এরাবিয়ান নাইটস' নামেও পরিচিত। এটি সমস্ত আরবি সাহিত্যের সর্বাধিক পরিচিত সাহিত্য, যা এখনও আরবি সংস্কৃতি সম্পর্কে অনারবদের কাছে বহুল পরিচিত নাম। একটি পুরনো পারসিক বইয়ের (হাজার আফসানা) উপর ভিত্তি করে এর গল্পগুলো লেখা হয়েছিল। সেই বইতে ভারতেরও অনেকগুলো কাহিনী ছিল। জনপ্রিয় আরবি গদ্য কল্পকাহিনীর কিছু উদাহরণ হলো আলাদিন ও তার আশ্চর্য জাদুর প্রদীপের গল্প, এবং আলি বাবা ও চল্লিশ চোরের কাহিনী, যদিও তা এই বইয়ের অংশ ছিল না। মূল গল্পগুলোর বেশিরভাগই সম্ভবত প্রাক-ইসলামিক যুগের। এগুলোর মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন প্রাণীর উপকথা, হিতোপদেশ, হাস্যরসাত্মক ও নৈতিক গল্প আরব্য রজনীর এক হাজার এক রাত' এর একটি পুরাতন কপি;

আরব্য রজনী ইংরেজি বইয়ের সংস্করণের প্রচ্ছদ;
আরবি সাহিত্যের অন্যান্য ধারা আরবি ভাষায় ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক রচনার প্রধান লেখকদের মধ্যে রয়েছেন বুখারি, আল-তাবারি, আল-মাসউদি, ইবনে খালদুন, ইবনে আল-আছির এবং ইবনে বতুতা। অগ্রগণ্য আরব ধর্মতত্ত্ববিদ ছিলেন আল-গাজ্জালি, চিকিত্সক ইবনে সিনা, যিনি চিকিৎসা ও ঔষধের উপর অনেক বই লিখেছেন। চিকিৎসাবিজ্ঞানের উপর তার লেখা ৫ খণ্ডের 'কানুন ফিতিব' নামের বিশ্বকোষ মুসলিম বিশ্বে এবং ইউরোপে ১৮ শতক পর্যন্ত প্রামাণ্য গ্রন্থ হিসেবে ব্যবহৃত হতো। চিকিৎসার উপর লেখা ইবনে সিনার একটি পাণ্ডুলিপির পাতা; 'কানুন ফিতিব' বইয়ের একটি পাতা;

ধর্মতাত্ত্বিক ও পরিব্রাজক ইবনে বতুতা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ও জায়গা ভ্রমণের জন্য বিখ্যাত হয়ে আছেন। তিনি একুশ বছর বয়স থেকে শুরু করে জীবনের পরবর্তী ৩০ বছরে পৃথিবীর এক স্থান থেকে অন্য স্থানে ঘুরে বেড়িয়েছেন। তার এই ভ্রমণকাহিনীগুলো 'রিহলা' নামক বইতে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। রিহলা একটি আরবি শব্দ। এর অর্থ ভ্রমণকাহিনী।

ইবনে বতুতার ভ্রমণকাহিনী 'রিহলা';
আল-বিরুনি ছিলেন ইসলামী স্বর্ণযুগের একজন পণ্ডিত ও বিজ্ঞানী। তিনি একাধারে পদার্থবিদ, গণিতবিদ, জ্যোতির্বিদ, ভূগোলবিদ ও ইতিহাসবিদ ছিলেন। তার উল্লেখযোগ্য কাজগুলোর মধ্যে আছে পৃথিবীর ব্যাসার্ধ ও পরিধি নির্ণয় পদ্ধতি, চাঁদের দশা বা পর্যায় ব্যাখ্যা ইত্যাদি। তিনিই সেই ব্যক্তি যিনি ১০০০ সালে ঘণ্টাকে প্রথম মিনিট ও সেকেন্ডে ভাগ করেছিলেন। তার উল্লেখযোগ্য বই তরিকা আল-হিন্দ, কিতাবুত তাহফিম।

আল বিরুনির জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্পর্কিত লেখা;
কাসির ছিলেন একজন মুহাদ্দিস, ফকিহ, মুফাসসির ও ইতিহাসবিদ। তার উল্লেখযোগ্য রচনার মধ্যে আছে পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যাগ্রন্থ 'তাফসির ইবনে কাসির', ইতিহাস গ্রন্থ

'আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া'। তার 'আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া' গ্রন্থের ভাষা ও সাহিত্যমান উচ্চস্তরের হওয়ায় বিখ্যাত আরবি সাহিত্যিকদের কাছে এটি ব্যাপকভাবে প্রশংসিত।

ইবনে কাসিরের লেখা ইসলামের ইতিহাস গ্রন্থ 'আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া';

স্পেনের আরবি সাহিত্য

আরবী ভাষার কবিতাগুলোতে সুর ও সুন্দর শব্দ নির্বাচনের জন্য সকল শ্রেণীর মানুষের কাছেই সমাদর পেয়েছিল। শব্দের সৌন্দর্য ও মধুর উচ্চারণ ধ্বনিতে আনন্দ অনুভব করা ছিল আরবী কবিতার একটি বৈশিষ্ট্য এবং সুদূর স্পেনের মাটিতেও তার প্রকাশ ঘটেছিল। প্রথম উমাইয়া শাসক ও তার বেশ কয়েকজন উত্তরসূরি ছিলেন কবি। ফলে স্পেনের কর্ডোবাতেও কাব্য প্রতিভার অগ্নিশিখা জ্বলে উঠেছিল।

মুওয়াশশাহ্

প্রচলিত নিয়মের বাইরে গিয়ে স্পেনীয় আরবী কবিতা নতুন ছন্দোবদ্ধ রূপ গড়ে তুলেছিল এবং প্রকৃতির সৌন্দর্যের প্রতি আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছিল। পল্লীগীতি ও ভালবাসার গানের মধ্য দিয়ে এক রোমান্টিক অনুভূতির প্রকাশ ঘটেছিল যা ছিল মধ্যযুগীয় বীরত্বের পূর্বসুরী। একাদশ শতাব্দীর শুরুতে 'মুওয়াশশাহ' ও 'জাজল' নামে একধরনের গীতিকবিতার জন্ম হয়েছিল আন্দালুসে। উভয় গীতিকবিতাই সমবেত সঙ্গীত ধারার ওপর ভিত্তি করেই রচিত হয়েছিল, এবং সেগুলো সমবেতভাবেই গাওয়া হতো। বিশিষ্ট মুওয়াশশাহ্ রচয়িতাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন টুডেলার অন্ধ কবি আবু-আল আব্বাস আল-তিউতিলি। এছাড়া অপর এক বিশিষ্ট কবি ছিলেন মুহাম্মাদ ইবন-ইউসুফ আবু-হায়্যানি (১২৫৬-১৩৪৪ খ্রিষ্টাব্দ) যিনি বার্বার সম্প্রদায়ের এক বহুভাষিক ব্যক্তি ও গ্রানাডার অধিবাসী ছিলেন।

আন্দালুসের শ্রেষ্ঠ কবি হিসেবে পরিচিত ছিলেন আবুল ওয়ালিদ আহমদ ইবন জায়দুন (১০০৩-১০৭১ খ্রিষ্টাব্দ)। স্পেনের মাটিতে আরব মহিলাদের মধ্যে কাব্য ও সাহিত্যের প্রতি বিশেষ অনুরাগ ও সহজাত প্রবণতা লক্ষ করা গিয়েছিল। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য একজন ছিলেন ওয়াল্লাদা (মৃত্যু আনুমানিক ১০৮৭ খ্রিষ্টাব্দ)। এই প্রতিভাময়ী কবি তার অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ও সাহিত্যক্ষমতার জন্য বিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন। এজন্য তাকে বলা হতো স্পেনের স্যাফো। ওয়াল্লাদার উদ্দেশে রচিত ইবন জায়দুনের বহু কবিতাতেই আল-জাহ্রা ও তার বাগানগুলোর সৌন্দর্যের ছবি এবং প্রকৃতির প্রতি গভীর অনুরাগের ছবি ফুটে উঠেছে। স্পেনীয় আরবী কবিতার এটাই প্রধান বৈশিষ্ট্য।

ইবন জায়দুনের স্মৃতিস্তম্ভ;

তুলনামূলকভাবে কম খ্যাতিসম্পন্ন প্রতিভাধরদের মধ্যে আবু-ইসহাক ইবন-খাফাজার, ইবন-আবদ-রাব্বিহ্, ইবন-হাজম্ ও ইবন-আল-খাতীব উল্লেখযোগ্য। এছাড়া স্পেনের মাটিতে আরও কয়েকজন কবির আবির্ভাব ঘটেছিল যাদের রচনাগুলোকে এখনও উন্নতমানের বলে গণ্য করা হয়।

সাধারণভাবে আরবী কবিতা, বিশেষ করে এই গীতিকবিতাগুলো স্পেনের খ্রিস্টানদের আকর্ষণ করেছিল এবং তারা শ্রদ্ধার সাথে তা আত্মস্থ করত। জাজল ও মুওয়াশশাহ্ নামে এই দুই ধরনের গীতিকবিতা ক্যাস্টিলিয়ার জনপ্রিয় কবিতার রূপ 'ভিল্যানসিকো'তে গ্রহণ করা হয়েছিল। এই ভিল্যানসিকো বড়দিনের ভজনসংগীতসহ খ্রিস্টানদের প্রার্থনায় ব্যবহৃত হতো। এই সনেট বা চতুর্দশপদী কবিতার শেষের ছয় চরণ সাধারণত সিডিই (CDE), সিডিই (CDE) ইত্যাদি ছন্দে উচ্চারিত হতো, এবং আন্দালুসীয় কবিদের রচনাবলিতে বিশেষত আরবী জাজলেই তা লক্ষ করা যায়।

সময়ের সাথে সাথে বিভিন্ন যুগের শাসনামলে আরবি ভাষায় বহু সাহিত্যকর্ম রচিত হয়েছে যা আরবি সাহিত্যের ভান্ডারকে করেছে সমৃদ্ধ। ঊনবিংশ শতাব্দীর সময় মিশর, লেবানন এবং দামেস্ককে কেন্দ্র করে আরবি ভাষায় মুদ্রণ ব্যবস্থা চালু হয়েছিল। এ সময় সংবাদপত্র, বিশ্বকোষ এবং বিভিন্ন বই প্রকাশিত হতে থাকে যেখানে আরব লেখকরা আরবী ভাষায় নিজেদের অনুভূতি এবং আধুনিক বিশ্বে তাদের অবস্থান প্রকাশ করার চেষ্টা করেছিলেন। বিভিন্ন প্রকার গদ্য, যেমন- গল্প, উপন্যাস রচিত হতে থাকে। একইসাথে এসব সাহিত্যে পশ্চিমা বিভিন্ন প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে উপন্যাস, নাটক লেখা হতে থাকে। সে যা-ই হোক, আরবি সাহিত্য যে তার গুণ ও মাধুর্য দিয়ে যুগ যুগ ধরে মানুষের মনকে বিমোহিত করে আসছে তা অনস্বীকার্য। বলা বাহুল্য যে এটা আরো দীর্ঘ সময় ধরে চলমান থাকবে।